স্বপ্নদ্বীপ

২২শে মার্চ

অনেকে বলেন যে, স্বপ্নে নাকি আমরা সাদা আর কালো ছাড়া অন্য কোনও রং দেখি না। আমার বিশ্বাস আসল ব্যাপারটা এই যে, বেশিরভাগ সময় স্বপ্নের ঘটনাটাই কেবল আমাদের মনে থাকে ; রং দেখেছি কি না দেখেছি, সেটা আমরা খেয়ালই করি না ! মোট কথা, কাল রাত্রে আমি এমন একটা ঝলমলে রঙিন স্বপ্ন দেখেছি যে সেটার কথা না লিখে পারছি না।

দেখলাম আমি একটা অদ্ভুত জায়গায় গিয়ে পড়েছি। সেখানে ঘরবাড়ি লোকজন কিছুই নেই—আছে শুধু গাছপালা আর বনজঙ্গল। এইসব গাছপালার একটিও আমার চেনা নয়। এদের রংও ভারী অস্বাভাবিক। সবুজ পাতা প্রায় নেই বললেই চলে। তার বদলে নীল লাল বেগুনি কমলা এই ধরনের রং। গাছে ফুল আর ফলও আছে—তার একটাও আমার চেনা নয়। একটা প্রকাণ্ড ফুলে অজস্র পাপড়ি আর প্রত্যেকটা পাপড়ির রং আলাদা। আর একটা ফুলের এক-একটা পাপড়ি যেন এক-একটা হাতির কান, আর হাতির কানের মতোই সেগুলো মাঝে মাঝে দুলে দুলে উঠছে। ফলও যে কত রকমের রয়েছে, তার ঠিক নেই। একটা প্রকাণ্ড গাছে সরু সরু নীল রঙের ফল বটগাছের শিকড়ের মতো মাটিতে গিয়ে নেমেছে। আর একটা তরমুজের সাইজের ফল—তার সর্বাঙ্গে গাঢ় লাল রোঁয়া, আর সেই রোঁয়ার ভিতর দুটো করে গোল গোল সাদার মাঝখানে কালো ফুটকি। ঠিক যেন মনে হয়, ফলের গায়ে একজোড়া চোখ।

স্বপ্নটা এতই জলজ্যান্ত যে, মনে হচ্ছিল এ রকম একটা জায়গা সত্যিই আছে, আর আমি যেন সত্যিই সেখানে গেছি। আর রঙের কথাটাও ভুলতে পারছি না। স্বপ্নটা দেখা অবধি বাইরে কোথাও ঘুরে আসতে ইচ্ছা করছে। বিশেষ করে এমন কোনও জায়গায়, যেখানে রঙিন গাছপালা ফুল-ফলের প্রাচুর্য। গিরিডিতে বছরের এই সময়টা রঙের বড় অভাব। যাক গে—এখন স্বপ্ন ছেড়ে বাস্তবে আসা যাক।

আমার অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি নিয়ে গবেষণা বেশ আশাপ্রদ ভাবে এগোচ্ছে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটা ধাতু তৈরি করা, যেটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করতে পারে। অর্থাৎ—সে-ধাতুর কোনও ওজন থাকবে না। তাকে শূন্যে ছেড়ে দিলে সে শূন্যেই থেকে যাবে। এই অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ধাতুর সাহায্যে একটা ছোটখাটো উড়োজাহাজ তৈরি করতে পারলে খুব সহজেই এদিক ওদিক বেড়িয়ে আসা যাবে।

আশ্চর্য এই যে সবচেয়ে ওজন বেশি যে ধাতুর—অর্থাৎ পারা বা **mercury**—সেটি ছাড়া এই ওজনবিহীন নতুন ধাতুটি তৈরি করা যাবে না, এটা আগে বুঝতে পারিনি। এখন বেশ বুঝতে পারছি যে, হ্যাকেনবুশের গবেষণা এই পারার অভাবেই ব্যর্থ হয়েছিল। পারা জোগাড় হয়েছে। তা ছাড়া তামার গুঁড়ো, ষাঁড়ের খুর, চকমকি পাথর ইত্যাদি অন্যান্য যাবতীয় উপাদানও যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ হয়েছে। আজ থেকে দ্বিগুণ

উৎসাহে কাজে লেগে পড়তে হবে। বর্ষা নামার বেশ কিছু আগেই আমার আকাশযানটি তৈরি করে ফেলতে হবে ; কারণ মাধ্যাকর্ষণকে পরাস্ত করতে পারলেও, ঝড়ঝঞ্ঝার দাপট একটা সামান্য উড়োজাহাজ সহ্য করবে কী করে ?

২৫শে মার্চ

আমার তৈরি অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ধাতুর কী নাম দেওয়া যায়, তাই ভাবছি। গবেষণা যে সফল হয়েছে, সেটা বলাই বাহুল্য। পাঁচ বছর বয়সে প্রথম যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রকাশ পায়, তখন থেকে আজ অবধি আমি কোনও গবেষণায় ব্যর্থ হইনি। এখনও মনে আছে, আমার সেই পাঁচ বছর বয়সের ঘটনাটা। খাটে বসে আমার বন্ধু ভুতোর সঙ্গে টিড্‌লি উইংক্‌স খেলছিলাম। সে-খেলা আজকাল আর কেউ খেলে কি ? সিকির সাইজের রং-বেরঙের সেলুলয়েডের চাকতির কিনারে আরেকটা বড় সাইজের চাকতি দিয়ে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেই সেগুলো তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে এগিয়ে যেত। সামনে একটা কৌটো রাখা থাকত। উদ্দেশ্য ছিল ছোট চাকতিগুলোকে এই ভাবে চাপ দিয়ে লাফ খাইয়ে কৌটোর মধ্যে ফেলা। সেদিন ভুতোর সঙ্গে খেলতে খেলতে হঠাৎ চাকতি লাফানোর বৈজ্ঞানিক কারণটা মাথায় এসে গেল, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে ফেললাম, ঠিক কোনখানটায় কতখানি জোরে চাপ দিলে চাকতি বাইরে না পড়ে ঠিক কৌটোর মধ্যে গিয়ে পড়বে। তারপর থেকে আর কি ভুতো আমার সঙ্গে পারে ? বাবা পাশে বসেছিলেন। আমার খেলা দেখে চোখ গোল গোল করে বললেন, 'তিলু, তোর হল কী ! এ যে একেবারে ভেলকি দেখিয়ে দিচ্ছিস তুই !...'

তেরো বছর বয়সে আমার মাথায় প্রথম পাকা চুল দেখা দেয়। সতেরো বছরে টাক পড়তে শুরু করে। একুশে পড়তে না পড়তে আমার মাথা-জোড়া টাক—কেবল কানের দুপাশে, ঘাড়ের কাছটায় আর ব্রহ্মতালুর জায়গায় সামান্য কয়েকগাছা পাকা চুল। অর্থাৎ আজও আমার যা চেহারা, পঁয়তাল্লিশ বছর আগেও ছিল ঠিক তাই।

ধাতুটার নাম শ্যাঙ্কোভাইট দেওয়া স্থির করলাম। আজ আমার বেড়াল নিউটনের চার থাবায় চার টুকরো শাঙ্কোভাইটের পাত বেঁধে দিয়ে তাকে মাথার উপর তুলে ছেড়ে দিতেই সে বেলুনের মতো ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল। আশ্চর্য দৃশ্য এবং আশ্চর্য আনন্দ। শুধু আমার আনন্দ নয়, নিউটনেরও। মাটিতে নেমেই সে দিব্যি টেনিস বলের মতো 'হপ্' করতে করতে আমার পায়ের কাছে এসে আমার পাৎলুনে গা ঘষতে লাগল।

আমার আকাশযানের নাম দেব শ্যাঙ্কোপ্লেন। প্লেনে একটা প্রপেলার অবশ্যই থাকবে, এবং তাতেই শূন্যে উঠে সামনের দিকে এগোনোর কাজটা হয়ে যাবে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর একটু আগে হিসেব করে প্রপেলারটা থামিয়ে দিলেই প্লেন ধীরে ধীরে ঠিক জায়গায় গিয়ে নামবে।

ভাল কথা—গত তিনরাত পর পর আবার সেই রঙিন জায়গার স্বপ্ন দেখেছি। প্রতিবারই জায়গাটা সম্পর্কে কিছু কিছু নতুন তথ্য জানতে পেরেছি। যেমন, সেদিন দেখলাম গাছপালা ভেদ করে পিছন দিকে সমুদ্রের জল দেখা যাচ্ছে। একটা নামও স্বপ্নের মধ্যে কে যেন বার বার আমার কানের কাছে বলতে লাগল... 'ফ্লোরোনা...ফ্লোরোনা...ফ্লোরোনা...'

বার বার মনে প্রশ্ন জাগছে—এমন জায়গা কি সত্যিই আছে ? স্বপ্ন সত্যি না হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তাও বলব—থাকলে বড় ভাল হত। কিন্তু কোথায় ? কোন গ্রহে আছে এমন জায়গা ? পৃথিবীতে তো এমন অদ্ভুত গাছপালার কথা কেউ জানে না, শোনেনি।

২৬শে মার্চ

অদ্ভুত ব্যাপার ! কাল রাত্রেও সেই একই জায়গার স্বপ্ন। এবার আরও কিছু অতিরিক্ত তথ্য জানা গেল। এই সব রংচঙে গাছপালার মধ্যে একটির গুঁড়িতে একটি গর্ত—যেমন অনেক বুড়ো বট-অশ্বত্থের গায়ে থাকে। সেই গর্ত দিয়ে একটা গুরুগম্ভীর গলার স্বরে কে যেন বলে চলেছে ল্যাটিচিউড সিক্সটিন নর্থ, লঙ্গিচিউড ওয়ান থার্টি-সিক্স ইস্ট...ল্যাটিচিউড সিক্সটিন নর্থ, লঙ্গিচিউড ওয়ান-থার্টি-সিক্স ইস্ট... ৮ দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের এই হিসেবে যে জায়গাটা বেরোয়, সেটা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে পড়ে। ম্যাপে দেখলাম, সেখানে নীল রং ছাড়া আর কিচ্ছুই নেই। অর্থাৎ ডাঙার কোনও চিহ্নই নেই। এটা আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম। ম্যাপে দেখানো কোনও জায়গায় এ সব গাছপালা থাকতেই পারে না।

পাঁচদিন পর পর একই স্বপ্ন দেখার ফলে জায়গাটাতে যাবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছে। একটা সম্ভবত-কাল্পনিক জায়গার প্রতি এ ধরনের আকর্ষণ মোটেই বৈজ্ঞানিকের লক্ষণ নয়, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু কী আর করি ? ডায়রিতে তো মনের আসল ভাবটা প্রকাশ করতে হয় !

আজ আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবু এসেছিলেন। শ্যাঙ্কোভাইট নিয়ে অবিনাশবাবুকে একটু চমকে দেবার ইচ্ছে ছিল। পাশেই টেবিলের উপর থেকে একটা টুকরো নিয়ে ভদ্রলোকের নাকের সামনে শূন্যে ছেড়ে দিতে সেটা সেখানেই রয়ে গেল।

ভদ্রলোক মিনিটখানেক সেটার দিকে চেয়ে থেকে বিন্দুমাত্র অবাক না হয়ে বললেন, 'দিব্যি উড়ে রয়েছে, অথচ ডানার ভন্‌ভনানি তো শুনতে পাচ্ছি না ! কী পোকা মশাই !'

ভদ্রলোক আমার এত পরিশ্রমের এত সাধের আবিষ্কারটিকে এককথায় পোকার পর্যায়ে ফেলে দেবেন, তা ভাবতে পারিনি। অবশ্য ওঁর মতো অবৈজ্ঞানিকের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

ভদ্রলোক এবার শূন্যে ভাসমান চাকতিটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললেন, 'আজকের কাগজে খবর দেখেছেন ?'

'কী খবর ?'—আমি যখন গবেষণায় ব্যস্ত থাকি, তখন অনেকসময় খবরের কাগজ দেখার আর সুযোগ হয় না। অবিনাশবাবু পকেটে হাত দিয়ে একটা বাংলা কাগজের ছেঁড়া অংশ বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। খবরটা পড়ে আমি রীতিমতো বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে উঠলাম।

ইউরোপের সাতজন স্বনামধন্য মনীষী একজোটে উধাও হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ইংল্যান্ডের পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর সিড্‌নি হ্যামলিন ও জাপানের দার্শনিক হামুচি হামাদাকে আমি চিনি। অন্য পাঁচজন হচ্ছেন ইতালির গণিতবিশারদ উমবের্তো কারবোনি, জার্মানির বায়োকেমিস্ট ডক্টর আডল্‌ফ ব্রোডেন, সুইডেনের ভূতত্ত্ববিদ ওলসেন বোর্গ, ফ্রান্সের মনস্তত্ত্ববিদ আঁরি ভিল্‌মো আর রুশ ভাষাবিদ ভ্লাদিমির তুশেঙ্কো। এঁরা সকলেই ফিলিপিনের রাজধানী ম্যানিলা শহরে একটা আন্তর্জাতিক মনীষী সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। আমারও নেমন্তন্ন ছিল, কিন্তু শ্যাঙ্কোভাইটের কাজটা ফেলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সাতজনেই একদিনে একই সময়ে অদৃশ্য হয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে ম্যানিলার সমুদ্রতীর থেকে একটি স্টিমলঞ্চও অদৃশ্য হয়েছে। খবরে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, এই সব মনীষীদের হয়তো কোনও দুর্বৃত্তের দল কোনও অজ্ঞাত কারণে 'কিডন্যাপ' করেছে।

খবরটা মোটেই ভাল নয়। অবিনাশবাবু বললেন, 'কদ্দিন বলিচি, বাড়ির বাইরে একটা পাহারার বন্দোবস্ত করুন। নিমু হালদারকে বললেই বারো মাসের জন্য একটা পুলিশ

মোতায়েন করে দেবেন ফটকের সামনে। অতি সাহস মূর্খের লক্ষণ—এ প্রবাদটা বোধ হয় জানা নেই আপনার...'

আমি অবিশ্যি আশাবাদী মানুষ ; কিংবা স্বপ্ন আর শ্যাঙ্কোভাইট মিলিয়ে আমার মনের অবস্থাটা হয়তো একটু অতিমাত্রায় হালকা ছিল, তাই বললুম, 'ও সব কিডন্যাপিং ট্যাপিং সব রং চড়ানো গল্প। আমার বিশ্বাস ভদ্রলোকেরা নিজেরাই উদ্যোগ করে সমুদ্রভ্রমণে বেরিয়েছেন—দু' একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন।'

মুখে যাই বলি, মনের মধ্যে একটা খচখচানি রয়ে গেল। শ্যাঙ্কোপ্লেনের জন্য জোগাড়যন্ত্র করতে করতে বার বার হ্যামলিন ও হামাদার কথা মনে পড়ছিল।

২রা এপ্রিল

পরশু সকালে আমরা গিরিডি থেকে রওনা হয়েছি। 'আমরা' বলছি, কারণ অবিনাশবাবু আমার সঙ্গ ছাড়লেন না। আফ্রিকার অভিজ্ঞতার পর ভদ্রলোকের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতাবোধও রয়েছে ; তাই তাঁর অনুরোধ রক্ষা না করে পারলাম না। বললেন, 'এমনিতে এরোপ্লেন চড়ার কোনও সখ নেই আমার, তবে আপনি যখন বলছেন যে আপনার এ-যন্ত্রটি ক্র্যাশ করবে না, তখন যেখানেই যেতে চান চলুন, আমি সঙ্গে আছি। তবে কোথায় যাচ্ছেন, সেটাও তো একবার জানা দরকার। তিব্বত টিব্বত নাকি ?'

আমি একটু রসিকতা করেই বললাম, 'ল্যাটিচিউড সিক্সটিন নর্থ—লঙ্গিচিউড ওয়ান থার্টি-সিক্স ইস্ট।'

তাতে ভদ্রলোক বললেন, 'ও সব ল্যাটাচি-লঙাচি রাখুন মশাই—আপনার ব্যাঙাচির মধ্যে আমার অ্যাটাচির জায়গাটা হবে কি না সেইটে বলুন। আপনার মতো এক কাপড়ে বেশিদিন চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব।'

আমার প্লেনের সাইজ লম্বায় সাড়ে আট ফুট আর চওড়ায় তিন ফুট। লেজ আছে, ডানা নেই। ওঠা-নামার জন্য দুদিকে দুটো কান্‌কোর মতো জিনিস আছে। প্রপেলার অবশ্যই আছে, আর মাটিতে নেমে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য ব্যবস্থা আছে। বসার আসন হবে বলে আমার বাড়িরই দুটো পুরনো কৌচের মখমলের সিট খুলে প্লেনের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। প্লেনের অবস্থান উচ্চতা গতিবেগ ইত্যাদি নির্ণয় করার জন্যেও যন্ত্রপাতি অবশ্যই আছে।

খাওয়ার ব্যাপারটা সহজ করে নিয়েছি। দুটো বয়ামে দুমাসের মতো 'বটিকা ইন্ডিকা' নিয়েছি—এক বড়িতেই সারাদিনের জন্য পেট ভরে যাবে। তেষ্টা মেটানোর জন্য 'তৃষ্ণাশক' বড়ি আছে, আর আছে টি-পিল্‌স আর কফি-পিল্‌স। আমার জন্য শুধু কফি-পিল্‌স হলেই চলত, কিন্তু অবিনাশবাবুর আবার দিনে তিন বার চা না হলে চলে না। এ ছাড়া আর যে ক'টা জিনিস আছে, সেগুলো বাইরে গেলেই আমি সঙ্গে নিই—আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তল, আমার অম্‌নিস্কোপ, আমার ছবি তোলার ক্যামেরাপিড যন্ত্র। প্রপেলার ইঞ্জিনের জন্য রসদ হিসেবে নিয়েছি দুটিন টার্বোলিন। তার মানে পঞ্চাশ হাজার মাইলের জন্য নিশ্চিন্ত। আমার তৈরি এই তেলের গন্ধ ঠিক চন্দন কাঠের মতো। অর্থাৎ আমার সঙ্গে যা কিছু নিয়েছি তা সবই আমারই গবেষণাগারে তৈরি—এভিরিথিং মেড বাই শঙ্কু—এক আমার সহযাত্রী অবিনাশ মজুমদার ছাড়া।

প্লেনের গতি এখন ২০০ মাইল পার আওয়ার, উচ্চতা ২৫০০ ফুট। এই দুদিনে আমরা প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইল এসেছি। যে রাস্তায় যাব ঠিক করেছিলাম, সেই রাস্তাতেই চলেছি। বঙ্গোপসাগরে পড়ে পুব-দক্ষিণে চলেছি সুমাত্রার দিকে। সুমাত্রা পৌঁছে সেখান

থেকে পুবে ঘুরে বোর্নিওর উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ব প্রশান্ত মহাসাগরে। তারপর ডাঙা এড়িয়ে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে উত্তর-পুবে আমাদের লক্ষ্যস্থল ল্যাটিচিউড ষোলো নর্থ ও লঙ্গিচিউড একশো ছত্রিশ ইস্টের দিকে ধাওয়া করব। যদি আকাশ থেকে বুঝি সেখানে কিছু আছে, তবে সেখানে গিয়েই নামব ; না থাকলে উলটোপথে ঘুরে এসে দু-একটা মনোরম জায়গা বেছে নিয়ে দু-একদিন করে থেকে হাওয়া বদল করে আবার দেশে ফিরে আসব।

এই কিছুক্ষণ আগে আমরা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পেরোলাম। নিকোবরের উপর দিয়ে যাবার সময় কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে আর কিছুটা কৌতূহলবশত প্লেনটাকে একটু বেশি নীচে নামিয়ে ফেলেছিলাম। নারকেল গাছের পাতাগুলো প্রায় ছোঁয়া যায় বলে মনে হচ্ছিল। এমন সময় অবিনাশবাবু হঠাৎ একটা বিকট আর্তনাদ করে উঠলেন। ফিরে দেখি, তাঁর হাতের আস্তিনের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে গিয়ে হাওয়ায় পৎ পৎ করছে, আর মুখটা হয়ে গেছে কাগজের মতো ফ্যাকাশে। কী ব্যাপার !

অবিনাশবাবু ঘাড় কাত করে নীচের দিকে ইঙ্গিত করলেন, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনটে তির সাঁই সাঁই করে আমার প্লেনের পাশ দিয়ে চলে গেল আকাশের দিকে।

বোতাম টিপে তৎক্ষণাৎ প্লেনটাকে উপর দিকে ওঠাতে ওঠাতে দেখলাম নীচে এক পাল কালো বেঁটে লোক, তাদের হাতে তির-ধনুক, গায়ে উলকি, কানে মাকড়ি আর পরনে কিছু নেই বললেই চলে। তিনশো ফুট উপরে উঠে তবে নিকোবরের বন্য আদিবাসীদের মারাত্মক আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া গেল।

এ ছাড়া আরও একটা ঘটনা ঘটেছে আরও আগে—সেটার কথাও এই ফাঁকে বলে রাখি।

কলকাতার দক্ষিণে পোর্ট ক্যানিং পেরোবার কিছু পরেই একপাল শকুনি আমাদের সঙ্গ নিল। তখন আমরা আছি প্রায় পাঁচশো ফুট হাইটে। ইচ্ছে করলেই স্পিড বা হাইট বাড়িয়ে শকুনির সঙ্গ ত্যাগ করতে পারতাম, এবং অবিনাশবাবুরও ইচ্ছে ছিল সেটাই, কিন্তু আমার কৌতূহল ছিল শকুনিগুলো কোথায় গিয়ে নামে সেটা দেখব।

সুন্দরবনের উপর দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন সব ক'টা শকুনি হঠাৎ একসঙ্গে নীচের দিকে গোঁৎ খেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটাকে নীচে নামাতে শুরু করলাম। পাঁচশো ফুট থেকে ক্রমে চারশো তিনশো দুশো করে নেমে শেষে এমন হাইটে পৌঁছোলাম যেখানে গাছের পাতার মধ্যে পাখির বাসায় ডিম পর্যন্ত দেখা যায়।

শকুনিগুলো চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে বনের মাঝখানে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে নামল। প্লেনের প্রপেলার বন্ধ করে ভাসতে ভাসতে নীচের দিকে প্রায় পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে নেমে বুঝলাম কীসের লোভে শকুনিরা এখানে নেমেছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। একটি বিশাল রয়েল বেঙ্গল টাইগার পাশেই বোধ হয় কোনও গ্রাম থেকে একটা আস্ত গোরুকে ঘায়েল করে টেনে নিয়ে এসেছে নিরিবিলিতে তাকে ভক্ষণ করবে বলে।

অবিনাশবাবু আমার কোটের কলারটা পিছন দিক থেকে খামচে ধরলেন। বাঘটাও দেখলাম আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে একদৃষ্টে আমাদের প্লেনটাকে দেখতে লাগল। শকুনিগুলো আশেপাশের গাছের মগডালে গিয়ে বসেছে—বাঘ যদি কিছু অবশিষ্ট রাখে, তাই দিয়েই হবে তাদের ভোজ।

আমার প্লেন এখন চল্লিশ ফুট হাইটে। সামনে একশো হাতের মধ্যে বাঘ। এবার প্লেনের শব্দ ছাপিয়ে তার গর্জন শুনতে পেলাম।

আমি আর অপেক্ষা না করে পকেট থেকে অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা বার করে বাঘের দিকে তাগ করে ঘোড়া টিপে দিলাম। পরমুহূর্তেই দেখা গেল যেখানে বাঘ ছিল সেখানে একটা

ধোঁয়ার কুণ্ডলী, আর তার পরে তাও নেই।

এখন আমরা যেখান দিয়ে উড়ছি, তার চারদিকে—এই আড়াই হাজার ফুট থেকেও—যত দূর চোখ যায়, জল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

চমৎকার উড়ছে আমার শ্যাঙ্কোপ্লেন। ঝাঁকানি নেই একটুও, তাই লিখতে কোনওই অসুবিধা হচ্ছে না। প্রপেলারের আওয়াজের জন্যই বোধ হয় অবিনাশবাবুর কথা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। তাতে তাঁর খুব একটা আপশোস হচ্ছে বলে মনে হয় না। গিরিডিতে ভদ্রলোক এক মিনিটও চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। এখানে বাধ্য হয়ে মৌনতা অবলম্বন করেও দেখছি তাঁর ঠোঁটের কোণে একটা হাসি লেগেই আছে। বার দুয়েক ভদ্রলোককে ঘুমিয়েও পড়তে দেখেছি, তবে কোনওবারই বেশিক্ষণের জন্য নয়।

সত্যি বলতে কী, আমার একটা কথা শুনেই বোধ হয় ভদ্রলোক ঘুমের মাত্রাটা কমিয়ে দিয়েছেন। পরশু সকালে প্লেনে ওঠার কিছুক্ষণ আগে কথাচ্ছলে ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনি কি কখনও খেয়াল করেছেন যে একজন সাধারণ মানুষ তার জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ ঘুমিয়েই কাটায় ?'

ভদ্রলোক আমার কোনও কথা অবিশ্বাস করলেই খিক্ খিক্ করে হেসে এদিক ওদিক মাথা নাড়াতে থাকেন। তখনও সেটাই করে বললেন, 'মশাই, এ সব ছেলে-ভুলোনো আজগুবি কথা আপনি আপনার চাকর পেল্লাদকে বলুন, আমাকে বলবেন না।' কী মুশকিল ! আমি বললাম, 'আপনি রাত্রে কখন ঘুমোন ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এই ধরুন দশটা কি সাড়ে দশটা।'

'আর ওঠেন ?'

'ঘড়ি ধরে ছ'টা।'

'তার মানে ক' ঘণ্টা ঘুমোনো হল ?'

'এই সেরেছে—হিসেব করতে হবে ?' বলে অবিনাশবাবু ভুরু কুঁচকে মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললেন, 'প্রায় আট ঘণ্টা।'

'ক'ঘণ্টায় এক দিন হয় ?'

'আবার প্রশ্ন ? দাঁড়ান—চব্বিশ তো। চব্বিশ না ?'

'চব্বিশ। তিন আষ্টে চব্বিশ। তার মানে একদিনের তিনভাগের একভাগ সময় আপনি ঘুমোন—তাই তো ?'

ভদ্রলোক এবার যেন এক পলকে হিসাবটা বুঝে নিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, 'সময়ের কী ওয়েস্ট বলুন তো। তিনভাগের একভাগ জীবন স্রেফ ঘুমিয়ে নষ্ট করা !'

আসলে ঘুমের প্রসঙ্গ তুলে যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, সেটা এই—আমি নিজে যেটুকু সামান্য সময় প্লেনে ঘুমিয়েছি, তার মধ্যেও আমার দ্বীপের স্বপ্ন দেখেছি—ফ্লোরোনা দ্বীপ—যেখানে মানুষ নেই, আছে কেবল বিচিত্র রকমের না-দেখা না-জানা গাছপালা আর ফুলফল।

৪ঠা এপ্রিল

কাল বিকেলে আমরা বোর্নিও ছাড়িয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছি। সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে প্লেন নামিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিলাম। অবিনাশবাবু নামবার মিনিটখানেকের মধ্যেই হাতের কাছে একটা কলাগাছ থেকে একছড়া কলা ছিঁড়ে নিয়ে, তার মধ্যে একটার খোসা ছাড়িয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলেন।

pathagar.blogspot.com

সুমাত্রার ঠিক মাঝখান দিয়ে বিষুবরেখা চলে গেছে। এখানকার গাছপালার সঙ্গে আমাদের দেশের আশ্চর্য মিল। কাছেই জঙ্গলের মধ্যে পেঁপে, বাঁশ, নারকেল ইত্যাদি চোখে পড়ছে। এতদূর পথ এসে দেশের সঙ্গে এত মিল পাওয়ায় ভারী অদ্ভুত লাগছিল।

অবিনাশবাবু দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে কলা খেতে খেতে গাছপালার পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে একটা বিকট শব্দ বেরোল। চেয়ে দেখি ভদ্রলোকের হাত থেকে কলার ছড়া মাটিতে পড়ে গেছে, তিনি হাত দুটোকে পিছিয়ে নিয়ে ঘাড় গোঁজ করে চোখ বড় বড় করে একটা গাছের দিকে চেয়ে আছেন। কী দেখলেন ভদ্রলোক ?

আমি ব্যস্তভাবে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক তাঁর সামনের গাছটার দিকে আঙুল দেখিয়ে কাঁপা গলায় বললেন, 'ওটা আবার কী মশাই ?'

যা দেখলাম তাতে আমি যেমন অবাক তেমনি খুশি। গাছের নীচের দিকের একটা ডালে বসে আছে একটা প্রাণী, সেটা জাতে বাঁদর হলেও সেরকম বাঁদর সচরাচর দেখা যায় না। এ বাঁদর সুমাত্রার অধিবাসী। সাইজে একটা বেড়ালের বাচ্চার মতো—চোখ দুটো মুখের অনুপাতে আশ্চর্য রকম বড়, হাত পা সরু সরু, আর সেগুলোকে যেভাবে ব্যবহার করে তাতে মনে হয় বাঁদরটা হয় ভারী নিস্তেজ, না হয় অত্যন্ত কুঁড়ে। আসলে কিন্তু এ-বাঁদর স্বভাবতই ওরকম ঢিমে, আর তাই এর নাম হল 'স্লো লরিস'।

অবিনাশবাবুর অবাক ভাব এখনও কাটেনি। আমি বাঁদরটার কাছে গিয়ে হাত বাড়াতেই সেটা ডাল থেকে আমার হাতের কবজির উপর চলে এল। অবিশ্যি এই সামান্য ঘটনাটা ঘটতে লাগল প্রায় দু'মিনিট। স্থির করলাম যে এই নিরীহ খুদে জানোয়ারটিকে আমার সঙ্গে নিয়ে নেব। নিউটনের একটা খেলার সাথী হবে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'ওর নাম দিন ঢিমু।'

ঢিমু এখন আমারই পাশে চুপচাপ বসে আছে। একবার দুহাত দিয়ে প্লেনের দরজাটা ধরে অতি সন্তর্পণে মাথা উঁচিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করেছিল। তারপর ঠিক সেইরকমই ধীরে মাথাটাকে নামিয়ে নিয়ে আমার কোলের উপর রেখে চুপচাপ পড়ে আছে।

৫ই এপ্রিল, সকাল আটটা

Long 136 E—Lat 16 N। দেড়শো মাইল দূর এবং দুহাজার ফুট হাইট থেকে এইমাত্র যে দৃশ্যটা দেখতে পেলাম সেটার কথা লিখে রাখি।

দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের মধ্যে একটা রামধনুর টুকরোর মতো দ্বীপ। অম্‌নিস্কোপ দিয়ে দেখে বুঝেছি এটাই আমার স্বপ্নে দেখা দ্বীপ। রংগুলো গাছপালার রং, তবে সেটা যে দ্বীপের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তা নয়। সামনের দিকে—অর্থাৎ আমাদের দিকে—রং কিছুটা কম, পিছন দিকটায় বেশি।

অম্‌নিস্কোপ এখন অবিনাশবাবুর হাতে। তাঁকে আমার স্বপ্নের কথাটা বলিনি। তিনি দৃশ্য দেখে আহা উহু করছেন। বললেন, 'চলুন মশাই—ওইখানেই নামা যাক। ভারী মনোরম জায়গা বলে মনে হচ্ছে।'

আমার মন বিস্ময়ে ভরে উঠেছে। স্বপ্নও তা হলে সত্যি হয় ! আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই দ্বীপে পৌঁছে যাব। ঢিমু দিব্যি আছে।

priyobanglaboi.blogspot.com

৫ই এপ্রিল, সকাল সাড়ে নটা

আমরা দশ মিনিট হল ল্যান্ড করেছি। এমন একটা অদ্ভুত জায়গাও তা হলে পৃথিবীতে থাকতে পারে। গাছপালা যে অদ্ভুত হবে, সেটা তো আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু এসে দেখছি এর মাটিও অন্যরকম। মাটি বলতে আমরা যা বুঝি, এটা তা নয়। এমনকী এটা

বালিও নয়। বালির চেয়ে অন্তত চারগুণ বড় লাল আর নীল রঙের দানার সমষ্টি এই মাটি। দূর থেকে লাল ও নীল একাকার হয়ে বেগুনিতে পরিণত হয় ; হাতে তুললে তবে বোঝা যায়, দানাগুলো আসলে দুরকম রঙের। দানার ওজন অসম্ভব রকম ভারী। একমুঠো হাতে নিয়ে মিনিটখানেকের বেশি রাখা যায় না—হাত টনটন করে।

আসল দেখবার জিনিস অবিশ্যি গাছপালা। দ্বীপের এদিকের গাছের রং দেখে কিঞ্চিৎ হতাশ হয়েছি। স্বপ্নে দেখা রঙের জেল্লা এতে নেই। সব রঙের মধ্যেই যেন একটা কালোর ছোপ পড়েছে, ডালপালা কুঁচকে কুঁকড়ে গেছে, গাছ নুইয়ে পড়েছে, ফুলের পাপড়ি শুকিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। এগুলো সব জীবন্ত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। তবে আমি জানি, দ্বীপের অন্য দিকটায় রঙের ছড়াছড়ি। এদিকে অবাক হতে হয় রং দেখে নয়, ফুল ফল পাতার সাইজ দেখে। একটু বিশ্রাম করে আমরা উলটোদিকটায় যাব।

শ্যাঙ্কোপ্লেনটা আমাদের হাত বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চমৎকার কাজ দিয়েছে আমার নিজের হাতে তৈরি এই আকাশযানটি। টিমু চুপচাপ মাটিতে বসে আস্তে আস্তে হাত দিয়ে নীল লাল দানাগুলো নাড়াচাড়া করছে। হাফপ্যান্ট পরা অবিনাশবাবু সমুদ্রের জলে হাত মুখ ধুয়ে কুলকুচি করে আমার কাছে এসে বনের দিকে দেখতে দেখতে বললেন, 'যাবার সময় সঙ্গে কিছু চারা নিয়ে যাবেন। আপনার বাগানে দু'একটা এরকম গাছ গজাতে পারলে বাহার হবে।'

ভদ্রলোক ফ্লোরোনার অনন্যসাধারণ বিশেষত্বটা বোধ হয় বুঝে উঠতে পারেননি, তাই ওঁর মনে বিস্ময়ের ভাব জাগছে না। টিমুর চালচলন লক্ষ করছি আগের চেয়ে যেন একটু বেশি দ্রুত। হয়তো তার মনেও একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, যদিও তার গোল গোল চোখে সেটা নতুন করে প্রকাশ পাবার কোনও উপায় নেই।

এইমাত্র একটা ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ম আওয়াজ কানে এল। ঠিক যেন কেউ হাসছে। বোধ হয় কোনও পাখিটাখি হবে, যদিও এসে অবধি একটি প্রাণীও চোখে পড়েনি। মাটিতে কোনও পোকামাকড় পর্যন্ত আছে বলে মনে হয় না, জীবজন্তু তো দূরের কথা। এদিক দিয়ে জায়গাটাকে ভারী নিরাপদ বলে মনে হয়। তাই বোধ হয় মনটা কী রকম হালকা হয়ে গেছে। মাথাটাও হালকা লাগছে। আমার গিরিডির গবেষণাগারে, আমার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সমস্যা, অঙ্কের হিসাব আর ফরমুলা—সবই যেন অন্য জগতের অন্য আর এক যুগের জিনিস বলে মনে হচ্ছে।

এদিকটায় এসেছি। বড় অলস লাগছে। চারিদিকে রং। স্বপ্নের সব কিছুই এখানে। আরেক অদ্ভুত ঘটনা। সেই হারানো সাতজনই সবাই এখানে। কী হয়েছে তাঁদের জানি না। সবাই বসে আছেন হাত পা ছড়িয়ে। সবাই যেন খোকা। সবাই যেন বোকা। খালি হা হা করে হাসেন। আর কী লিখি। আর কিছুই নেই লেখার। আমায় ডাকছে বোধ হয়। হ্যাঁ, আমায় ডাকছে, যাই আমি।

অবিনাশবাবুর কথা

আমি শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার লিখিতেছি। খাতা শঙ্কুমহাশয়ের। আজ তারিখ ৫ই এপ্রিল, সময় রাত আড়াইটা। লিখিবার অভ্যাস নাই। একমাত্র চিঠিপত্র ব্যতীত বহুকাল যাবৎ আর কিছু লিখি নাই। বাল্যকালে ইস্কুলে একবার প্রবন্ধ লিখিয়া শিক্ষকের বাহবা পাইয়াছিলাম, পঞ্চাশ বৎসর পরে পুনরায় লেখনী ধারণ করিতেছি। আজিকার ঘটনা লিপিবদ্ধ করা একান্ত কর্তব্য। আমারও যদি কিছু হয়, এই খাতা যে ব্যক্তির হস্তে পড়িবে,

তিনি এক অবিস্মরণীয়, আতঙ্কজনক অলৌকিক ঘটনার বিষয় অবগত হইবেন। আমার পশ্চাতে বিশ হাত দূরে বন। বনের বৃক্ষাদি হইতে যে রঙিন আলোক নির্গত হইয়া চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে, সেই আলোতেই লিখিতেছি। অন্য কোনও আলো নাই, কারণ আকাশ মেঘশূন্য হইলেও আজ অমাবস্যা।

এই দ্বীপে পঁহুছিয়া পূর্ব উপকূলে আধঘণ্টা কাল অবস্থানের পর শঙ্কু প্রস্তাব করিলেন যে, দ্বীপের অন্যত্র কী আছে বা না আছে তাহা একবার অনুসন্ধান করা উচিত। আকাশ হইতেই বুঝিয়াছিলাম যে দ্বীপটি বৃত্তাকার, এবং এই বৃত্তের ডায়ামিটার দুই মাইলের অধিক নহে। আমরা স্থির করিলাম অনুসন্ধান পদব্রজে না করিয়া আকাশযানের সাহায্যেই করা হইবে। অতএব বৃথা কালক্ষয় না করিয়া টিমুবানরকে সঙ্গে লইয়া আমরা রওয়ানা হইলাম।

ভূমি হইতে পঞ্চাশ ফুট উর্ধ্বে থাকিয়া দশ মাইল বেগে আমরা পশ্চিম উপকূলের উদ্দেশে উড়িয়া চলিলাম।

এক মাইল পথ এইভাবে চলিবার পর আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে যতই পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছি, নিম্নের বৃক্ষের বর্ণশোভা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। সতেরো মিনিটকাল এইভাবে উড়িবার পর শঙ্কুমহাশয়ের আকাশযানটি পুনরায় ভূমি স্পর্শ করিল।

যান হইতে উত্তীর্ণ হইবামাত্র একটা আশ্চর্য জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কাহার কী জানি একজোড়া সোনার চশমা মাটিতে পড়িয়া আছে, তাহার লেন্‌স্‌দ্বয় অপরাহ্ণের সূর্যালোকে ঝিক ঝিক করিতেছে। শঙ্কুমহাশয় একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া চশমাটি হাতে তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, 'হ্যামলিন।' অতঃপর আমরা হাঁটিয়া (টিমু আমার স্কন্ধে) আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে আরও কিছু আশ্চর্য জিনিস আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। প্রথমে একটা ধূসরবর্ণ ফেল্ট টুপি, তারপর একটা ওয়াকিং স্টিক, তারপর একটা সবুজ রঙের রেশমের রুমাল, তারপর বাঁকানো পাইপ, এবং সর্বশেষে এইসমস্ত কিছুর পর একটা আস্ত মানুষ।

ইনি সম্ভবত জাপানি অথবা চিনদেশীয়। পরনে গাঢ় নীল রঙের সুট। দুইটি সু-জুতার একটি হাতে লইয়া হাসি হাসি মুখে আমাদের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। লক্ষ করিলাম ভদ্রলোকের তিনটি দাঁত সোনা দিয়া বাঁধানো। শঙ্কুমহাশয় ভদ্রলোককে দেখিয়া 'হামাদা' শব্দটি উচ্চারণ করিলেন। উক্ত শব্দের অর্থ আমার বোধগম্য হইল না। জাপানি (বা চিনা) ভদ্রলোকটি কোনও কথাই কহিলেন না। কেবল সেই একই ভাবে দন্ত বিকশিত অবস্থায় বসিয়া রহিলেন।

শঙ্কু মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, 'কী বুঝিতেছেন?' তিনি আমার প্রশ্নে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি যেন আনন্দে বিহ্বল। দুইবার লাফাইলেন। দুইবার হাততালি দিলেন। তৎপরে পুনরায় হাঁটিতে লাগিলেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা আরও ছয়জন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইলাম। ছয়জনই বিদেশীয়। অর্থাৎ ইউরোপবাসী। একজন তাঁহার মনিব্যাগ হইতে এক একটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা বাহির করিয়া ব্যাঙবাজি খেলার ভঙ্গিতে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতেছেন, আর একজন অদম্য উৎসাহে ডিগবাজি খাইতেছেন, আর একজন জাঙিয়া পরিয়া দুই হাত নৃত্যের ভঙ্গিতে উত্তোলন করিয়া দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাহিতেছেন, আর একজন একটি ইংরাজি ছেলেভুলানো ছড়া—যাহার প্রথম পংক্তি 'ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ'—সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছেন। শেষোক্ত ব্যক্তিটিকে শঙ্কুমহাশয় 'হ্যামলিন' বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইবামাত্র ভদ্রলোক ব্ল্যাকশীপ ছাড়িয়া 'জ্যাকাঞ্জিল' ছড়াটি আবৃত্তি আরম্ভ করিলেন।

অবশিষ্ট দুইজনকে দেখিতে পাইলাম বৃক্ষতলে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রিত অবস্থায়। ইহার পর

শঙ্কুমহাশয় তাঁহার কোটের পকেট হইতে তাঁহার লাল ডায়রি খাতাটি বাহির করিয়া সমুদ্রতটে বসিয়া কী যেন লিখিতে আরম্ভ করিলেন। আমি পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই সবের অর্থ কী ? ইহারা কাহারা ? হ্যামলিন কে ? হামাদা কী ? ইহারা সকলেই ভদ্র এবং প্রবীণ হওয়া সত্ত্বেও নির্বোধ শিশুর ন্যায় আচরণ করিতেছে কেন ? সবকিছু দেখিয়া শুনিয়া আমি সবিশেষ চিন্তিত ও বিমূঢ়, কিন্তু আপনাকে এত নিশ্চিন্ত দেখিতেছি কেন ?' বলা বাহুল্য আমার কোনও প্রশ্নেরই কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। শঙ্কুমহাশয়ও দেখিলাম, অধিক লিখিতে পারিলেন না। খাতা ও ফাউন্টেন পেন তাঁহার পার্শ্বেই পড়িয়া রহিল, তিনি নির্বাক হইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমার পকেট-ওয়াচে দেখি ছয়টা বাজিতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। এতক্ষণ সময় কাটিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিতেই পারি নাই। সূর্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে, অল্পক্ষণের মধ্যেই অস্তমিত হইবে। সমুদ্র প্রায় নিস্তরঙ্গ, সুতরাং জলের শব্দ নাই বলিলেই চলে। পক্ষীর কাকলিও নাই, কারণ পক্ষীই নাই। টিমু ব্যতীত অন্য কোনও পশুও নাই ; মশার শব্দ, তক্ষকের ডাক, শৃগালের চিৎকার, ভেকের কলরব, ঝিঁঝির ঐক্যতান— কিছুই নাই। চারিদিকে অপার্থিব আদিম নিস্তব্ধতা।

গাছপালার দিকে দৃষ্টি গেল। পত্র-পুষ্প-ফুলে প্রতিটি গাছ টইটম্বুর, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র স্পন্দনের আভাস নাই। সমস্ত প্রকৃতিই যেন রুদ্ধশ্বাসে কীসের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। আরও একটি আশ্চর্য এই যে, ফুলফলের এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও কোনও প্রকার গন্ধ আমার নাসিকায় প্রবেশ করিতেছে না, না দুর্গন্ধ, না সুগন্ধ।

আমি অবাক হইয়া চারিদিকের অপূর্ব বন্য শোভা লক্ষ করিতেছি, এমন সময় সহসা আলোক হ্রাস পাওয়াতে বুঝিলাম সূর্য অস্ত গেল। পরমুহূর্তেই অনুভব করিলাম সমুদ্রের দিক

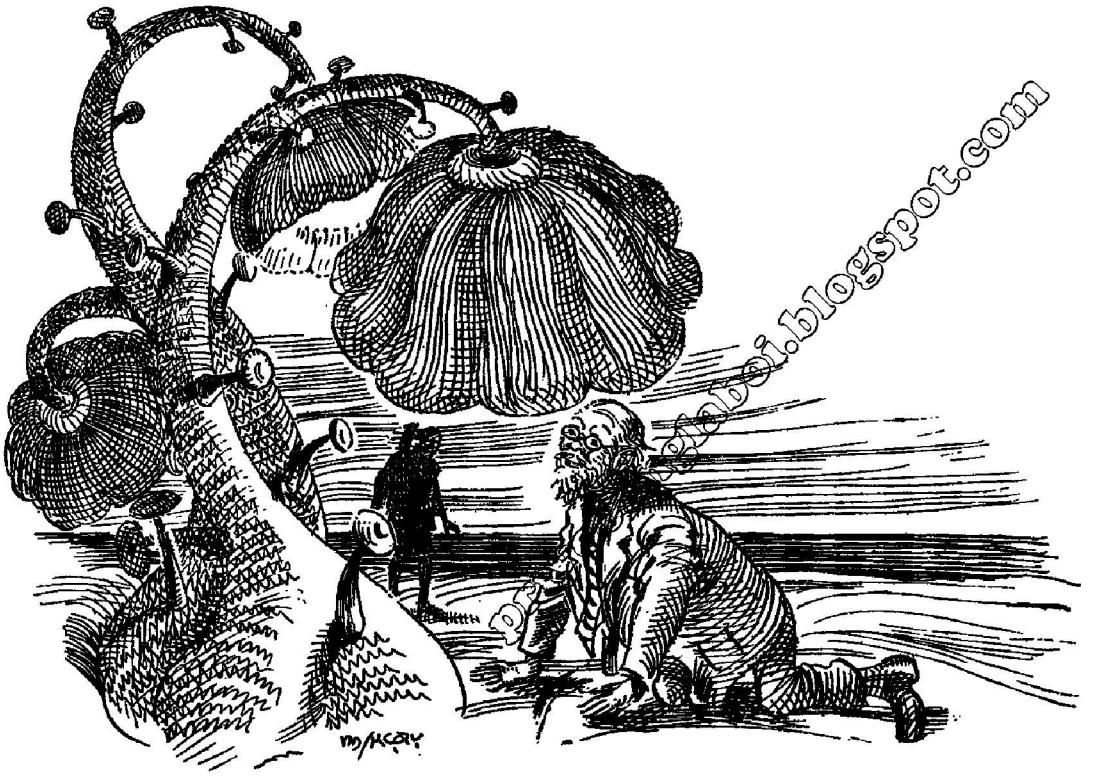

হইতে একটা দমকা হাওয়া আসিয়া বনের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিল। টিমুবানর আমা হইতে কিয়দ্দূরে বসিয়াছিল ; এক্ষণে সে ধীর পদক্ষেপে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া আমার স্কন্ধে স্থাপন করাতে সে তৎক্ষণাৎ আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। টিমু কি ভয় পাইয়াছে ? জানি না। ঈশ্বর করুন, নিরীহ বানরের যেন কোনওরূপ অনিষ্ট না হয়।

এ কীসের শব্দ ? সহসা চারিদিক হইতে সম্মিলিত সংগীতের মতো মিহি মোলায়েম স্বর উত্থিত হইতেছে।

হু হু হু হু রি রি রি রি করিয়া এই স্বর ক্রমে তীব্রতর হইয়া তারসপ্তকে উঠিল। আমি দুরু দুরু বক্ষে বনের দিকে চাহিতেই এক অদ্ভুত অভাবনীয় নূতন কাণ্ডের সূচনা লক্ষ করিলাম। বনের প্রতিটি বৃক্ষ যেন সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিটি পত্র, প্রতিটি ফুল ও ফল যেন সজীব ও অস্থির হইয়া বৃক্ষ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ছটফট করিতেছে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, কিন্তু বনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যেন আলোক বৃদ্ধি পাইতেছে।

শঙ্কুমহাশয় কি এ দৃশ্য দেখিতেছেন ?

অনুসন্ধানে বুঝিলাম তিনি স্থান পরিবর্তন করিয়াছেন অথবা করিতে চলিয়াছেন। শিশুর ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া তিনি একটি বিশেষ বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই বৃক্ষটি অন্যগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ, কারণ ইহার ফুলের রং বাদামি। এক একটি ফুল এক একটি বাঁধাকপির ন্যায় বৃহৎ। শঙ্কুমহাশয় বৃক্ষটির পাদদেশ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। অবাক হইয়া দেখিলাম, বৃক্ষস্থিত বৃহদাকার ফলগুলি যেন তাঁহাকেই অভিবাদন করিবার জন্য তাঁহারই দিকে নত হইতেছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া হঠাৎ কেন জানি আমার মনে গভীর ত্রাসের সঞ্চার হইল। শঙ্কুমহাশয়

যখন বৃক্ষমূল হইতে সামান্য দূরে, তখন আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া এক লম্ফে বৃক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ফুলটির নিম্নগতি রোধ করিবার জন্য আমার দুই হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিলাম। পরমুহূর্তে ফুলটি এক আশ্চর্য কাণ্ড করিয়া বসিল, যাহার কথা ভাবিলে এখনও আমার সমস্ত দেহ হিম হইয়া আসে। ফুল যে সর্পের ন্যায় ছোবল মারিতে জানে, ইহা আমার ধারণাতীত ছিল। এক্ষণে বুঝিলাম, আমার জ্ঞান কত সীমিত। সেই প্রকাণ্ড ফুলের ছোবলে প্রথমত টিমু আমার স্কন্ধ হইতে ছিটকাইয়া দশ হাত দূরে পড়িল। তাহার পর আমিও ধরাশায়ী হইলাম। পতনের সময় ফুলটিকে জাপটাইয়া ধরার ফলে আমার হস্তে তাহার একটি স্তবকের একটি সামান্য ছিন্ন অংশ রহিয়া গেল।

আর শঙ্কুমহাশয়? তিনি নিরুদ্বিগ্ন ভাবে হামাগুড়ি দিয়া বৃক্ষটির পাদদেশে পৌঁছিলেন, এবং ফুলটি নামিয়া আসিয়া তাঁহার মস্তক আচ্ছাদিত করিল। ইহার পর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখিলাম, ফুলের স্তবকগুলি শঙ্কুমহাশয়ের মস্তকের চতুর্দিকে বেষ্টন করিতেছে।

কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া ফুলটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া গেল। এক্ষণে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলাম, ফুলের বাদামি রং মুহূর্ত মধ্যে হলুদে পরিণত হইল। এই হলুদে কমলার ছোপ। এই হলুদ অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল, এবং সমগ্র বৃক্ষটিতে আন্দোলনের সঞ্চার হওয়ার ফলে এই হলুদকে লেলিহান অগ্নিশিখার মতোই প্রতীয়মান হইল।

শঙ্কুমহাশয়কে দেখিলাম, তিনি অন্য একটি বৃক্ষের দিকে হামাগুড়ি দিতেছেন।

আমি আর দেখিতে পারিলাম না। প্রায় দশ মিনিট কাল এইভাবে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিয়া অবশেষে শঙ্কুমহাশয় পুনরায় আমার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, যদিও তিনি আমার নৈকট্য সম্পর্কে আদৌ সচেতন বলিয়া বোধ হইল না। অর্ধনিমিলিত নেত্রে দুই বাহু উত্তোলন করিয়া হাসি হাসি মুখে তিনি কেবল দুইটি শব্দই বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—'টিডলি উইঙ্কস...টিডলি উইঙ্কস...টিডলি উইঙ্কস।'

প্রায় ত্রিশবার একইভাবে গদ্‌গদ কণ্ঠে উক্ত অর্থহীন শব্দটি উচ্চারণ করিয়া শঙ্কুমহাশয় ভূমিতে গাত্র এলাইয়া দিয়া হয় অচেতন না হয় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

বনে এখন উন্মাদনা। ফল-ফুলের সূতীক্ষ্ম বর্ণচ্ছটায় আমার চক্ষু দিয়া অশ্রু নির্গত হইতেছে, তাহাদের সমবেত রি রি রি রি রি রি সংগীতে কর্ণপটাহ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম, তাহাদের তাণ্ডবলীলায় বক্ষে কণ্ঠরোধকারী ত্রাসের সঞ্চার। এ কি স্বপ্ন না সত্যি? আমার স্কন্ধে টিমুবানর এখনও সজাগ। তাহার আচরণে কোনওরূপ পরিবর্তন নাই। দুই হাতে এখনও সে আমার গলা বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার বিশাল চক্ষুদ্বয়ে পরিপার্শ্বের বর্ণচ্ছটা প্রতিফলিত হইতেছে।

আমি বনের পার্শ্ব হইতে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইলাম। জাপানি ও বিদেশীয় যে সাতজনকে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের পুনরায় দেখিতে পাইলাম। তাহারা সকলেই এখন নিদ্রিত—হাত-পা ছড়াইয়া অসহায়ভাবে সমুদ্রতটে শায়িত। একমাত্র আমারই চক্ষু হইতে নিদ্রা বিতাড়িত। মনে মনে বলিলাম, শঙ্কুমহাশয়ের সহিত একত্রে দেশভ্রমণের বাসনা বোধ হয় চিরকালের জন্য মিটিল।

টিমুকে লইয়া একটি নির্জন স্থান দেখিয়া তথায় উপবেশন করিলাম। বিমানপোতটি যেমন রাখা ছিল তেমনই রহিয়াছে। সমুদ্রের জল তাহার দুই হাতের মধ্যে আসিয়া ছলাৎ ছলাৎ করিয়া পড়িতেছে। সামান্য তরঙ্গের আভাস দেখা যায় যেন জলের মধ্যে।

একমাত্র আমাদের দ্বীপ ব্যতীত আর সর্বত্রই প্রগাঢ় অন্ধকার। সমুদ্র কোথায় গিয়া আকাশের সঙ্গে মিলিয়াছে, তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই। মেঘমুক্ত আকাশে অগণিত নক্ষত্রের মধ্য দিয়া ছায়াপথ চলিয়া গিয়াছে। একটি উল্কাপাতও আমার দৃষ্টিগোচর হইল।

মুহূর্তের জন্য মনে হইল আমি এক বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিতেছি ; প্রকৃতপক্ষে আমি গিরিডিতেই আছি, নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিতে পাইব আমার পরিচিত অভ্যস্ত দৈনন্দিন জগতে ফিরিয়া আসিয়াছি। কিন্তু পরক্ষণেই আমার সাময়িক ভ্রান্তি দূর হইল, এবং আমি পুনরায় বিষাদ ও আতঙ্কে নিমজ্জিত হইলাম। অতঃপর স্থির করিলাম, শঙ্কুমহাশয়ের খাতায় আজিকার ঘটনা লিপিবদ্ধ করিব। শঙ্কুমহাশয়কে যে অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার আর কোনওদিন লেখনী ধারণ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু এ কী ? সহসা একটা আন্দোলন অনুভব করিতেছি কেন ? সমগ্র দ্বীপটাই যে দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভূমিকম্প নাকি ? জলরেখা আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে কেন ? আমাদের আকাশযান ক্রমশ ভাসিয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে কেন ? চারিপার্শ্ব হইতে হাহাকার উত্থিত হইতেছে কেন ?

এ কী—আমার হাফপ্যান্টের পশ্চাৎদেশে একটা আর্দ্র শীতলতা অনুভব করিতেছি কেন ? শেষ পর্যন্ত কি আমার অদৃষ্টে সলিলসমাধি রহিয়াছে ?

এখন আমার কোমর অবধি জল, আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় লিখিতেছি। টিমু আমার স্কন্ধে কম্পমান। দূরে সমুদ্রবক্ষে একটি আলোকবিন্দু দ্রুত অগ্রসর হইতেছে আমাদের দিকে। আর লেখা অসম্ভব। হে ইশ্বর—

প্রফেসর শঙ্কুর ডায়রি। গিরিডি, ৭ই জুলাই মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা

আমি আজ আবার লিখতে পারছি। এই তিন মাসে আমার হারানো বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনেকটাই ফিরে পেয়েছি। আমি যে ঊনসত্তরটা ভাষা জানতাম, তার মধ্যে ছাপ্পান্নটা এর মধ্যেই আবার বেশ সড়গড় হয়ে গেছে। বাকি ক'টা নতুন করে শিখে নিতে আরও মাস দুয়েক লাগবে বলে মনে হয়।

কাল হ্যামলিনের একটা চিঠি পেয়েছি। নিজের ভাষাতেই লিখেছে, কিন্তু তার মধ্যে বানান ও ব্যাকরণ দুইয়েরই অনেক ভুল। ফলে মনে হয়, ওর প্রোগ্রেস আমার চেয়ে অনেক বেশি ঢিমে। বাকি কয়জনের খবর জানি না। অনুমান করা যায় তাঁরা সকলেই বেঁচে আছেন, কারণ জাহাজে সুস্থ অবস্থায় উঠেছিলাম সকলেই। এখনও ভাবতে ভয় হয় যে, আমি যদি একা গিয়ে ফ্লোরোনাতে উপস্থিত হতাম, তা হলে আমাকে উদ্ধার করার জন্য ম্যানিলা থেকে কোনও জাহাজ আসত না। ফ্লোরোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি ও অবিনাশবাবু দুজনেই সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যেতাম।

হ্যামলিনের চিঠিতে জানলাম যে আমি ক'দিন থেকে যেটা অনুমান করছি সেটা ঠিকই। আমরা সবাই একই স্বপ্ন দেখে একই আকর্ষণে ফ্লোরোনায় হাজির হয়েছিলাম। খবরের কাগজে বেরিয়েছে যে আমরা আটজন ছাড়াও আরও বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ওই একই সময় একই স্বপ্ন দেখে ফ্লোরোনায় যাবার জন্য ছটফট করেছিলেন কিন্তু তাঁদের পক্ষে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত ওই বেয়াড়া জায়গাটাতে গিয়ে পৌঁছানোর কোনও উপায় ছিল না।

ফ্লোরোনা-রহস্যের ষোলো আনা সমাধান কোনওদিনই হবে বলে মনে হয় না। তবে যেটুকু জানতে পেরেছি, তা থেকে বাকিটা অনুমান করে নেওয়া কঠিন না। ফ্লোরোনায় যে এক বিচিত্র প্রাণীর খপ্পরে পড়তে হয়েছিল সেটা তো বুঝতেই পেরেছি। এই বোঝার ব্যাপারে অবিনাশবাবুর অবদান কম নয়। গত বুধবার ভদ্রলোক আমাকে দেখতে এসে আমায় একটা আশ্চর্য জিনিস উপহার দিলেন। হাতে নিয়ে রবারের টুকরো বলে মনে হল। ভদ্রলোকের দিকে চাইতেই তিনি হেসে বললেন, 'ফুলের ঘায়ে সত্যিই মূর্ছা গেসলুম মশাই। যে ফুল

আপনার মাথায় চেপেছিল—এ হল তারই পাপড়ির একটা টুকরো।'

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে জেনেছি, এই পাপড়ির সঙ্গে পৃথিবীর কোনও ফুলের কোনও পাপড়ির কোনও মিল নেই। এই পাপড়ির অ্যানাটমি অবিশ্বাস্য রকম জটিল ; প্রায় একজন মনুষ্যের মস্তিষ্কে যে ধরনের জটিলতা থাকে, এতেও তাই।

ফ্লোরোনার পশ্চিম উপকূলে যাবার পর আমি কী করেছিলাম না-করেছিলাম, তা আমার মনে নেই, কিন্তু অবিনাশবাবুর বর্ণনা থেকে বুঝতে পারলাম এই ফুল কোনও আশ্চর্য উপায়ে আমার মস্তিষ্ক থেকে আমার বিদ্যাবুদ্ধির অনেকটা নিংড়ে বার করে নিয়েছিল। তারপর একের পর এক আরও অন্য ফুলও এই কাজটি করার ফলে শেষে আমি যে অবস্থায় পৌঁছেছিলাম, তার সঙ্গে একটা নির্বোধ শিশুর কোনও পার্থক্য নেই। হ্যামলিনদের সাতজনেরও এই একই ব্যাপার হয়েছিল।

অবিনাশবাবুর মতে আমাকে শোষণ করার পর গাছের রঙের জেল্লা নাকি আশ্চর্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এ থেকে একটা জিনিসই প্রমাণ হয়—এবং সেটা এতই অস্বাভাবিক যে লিখতেও সঙ্কোচ বোধ করছি—ফ্লোরোনা দ্বীপের গাছপালার খাদ্য হচ্ছে জ্ঞান, যে জ্ঞান তারা শুষে নেয় পণ্ডিত ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক থেকে। শুধু তাই নয়, তেমন ভাবে ক্ষুধার্ত হলে এরা উর্বরমস্তিষ্ক লোকদের স্বপ্ন দেখিয়ে আকর্ষণ করে নিজেদের কাছে নিয়ে আসতে পারে। পৃথিবীর গাছপালা পুষ্টিকর খাদ্য আহরণ করে বাতাস, মাটি ও সূর্যের আলো থেকে। এই তিনটি জিনিসের একটিও যে এদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে না সেটা পূর্ব উপকূলের গাছগুলো দেখেই বুঝতে পারা গিয়েছিল।

সব শুনেটুনে অবিনাশবাবু বললেন, 'তা তো বুঝলাম—এরা না হয় জ্ঞান ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে। কিন্তু তাই বলে দ্বীপটা শেষ পর্যন্ত জলের তলায় তলিয়ে গেল কেন বলুন তো ?'

আমি বললাম, 'ফ্লোরোনা আসলে একটা দ্বীপ কি না, সে-বিষয়েও আমার মনে খটকা রয়েছে। আমার তো মনে হয় দ্বীপ না হয়ে অন্য কোনও সৌরজগৎ থেকে ছিটকে আসা গ্রহ বা গ্রহের অংশও হতে পারে। এমনকী, অন্য গ্রহ থেকে আসা একটা রকেট জাতীয়ও কিছু হতে পারে।'

আমার কথাটা শেষ হওয়ামাত্র কোত্থেকে জানি একটা ক্ষীণ, বিদ্রূপাত্মক হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠলাম।

অবিনাশবাবুর দিকে চেয়ে দেখি, তিনিও আমারই মতো হতভম্ব। টিমু ও নিউটনও দেখি খেলা থামিয়ে মেঝের উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কী হল ? কীসের শব্দ ? কে হাসল ?

এবার দৃষ্টি গেল আমার গবেষণার সাজসরঞ্জাম রাখা টেবিলের একটা কোণের দিকে। অবিনাশবাবুর দেওয়া পাপড়ির টুকরোটা সেখানে ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। নীচের দিকে চাইতে দেখলাম সেটা মাটিতে পড়ে আছে। অথচ আমি কিন্তু ফেলিনি।

পাপড়িটার রঙে কি সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে ?

ও সব আর ভেবে দরকার নেই। হাতের কাছেই দেরাজের মধ্যে আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা ছিল ; পাপড়ির দিকে তাগ করে সেটার ঘোড়া টিপে দিলাম।

অন্তর্হিত পাপড়িটার জায়গায় কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অবিনাশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এবার থেকে দিনে দশ ঘণ্টা ঘুমোব।'

আমি বললাম, 'হঠাৎ এ কথা কেন ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'রাত জেগে বই পড়ে মাথাটাকে জ্ঞানের ডিপো করে তো জীবনটাকে খোয়াতে বসেছিলেন। যা অবস্থা হয়েছিল আপনার, তাকে তো ছিবড়ে ছাড়া আর কিছুই বলা

যায় না—আবার জিজ্ঞেস করছেন, কেন ?'

ভদ্রলোককে দেবার মতো জুতসই কোনও উত্তর খুঁজে পেলাম না।

সন্দেশ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮

আশ্চর্য প্রাণী

১০ই মার্চ

গবেষণা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আমার জীবনে এর আগে এ রকম কখনও হয়নি। একমাত্র সান্ত্বনা যে এটা আমার একার গবেষণা নয়, এটার সঙ্গে আরও একজন জড়িত আছেন। হাম্‌বোল্টও বেশ মুষড়ে পড়েছে। তবে এত সহজে নিরুদ্যম হলে চলবে না। কাল আবার উঠে পড়ে লাগতে হবে।

১১ই মার্চ

আজও কোনও ফল পাওয়া গেল না। যদি যেত, তা হলে অবিশ্যি সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে যেত। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমাদের হবে কি না সন্দেহ। আমি অবিশ্যি আমার হতাশা বাইরে প্রকাশ করি না, কিন্তু হাম্‌বোল্ট দেখলাম আমার মতো সংযমী নয়। আজ ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, ওর পোষা বিরাট গ্রেট ডেন কুকুরটার পাঁজরায় একটা লাথি মেরে বসল। হাম্‌বোল্টের চরিত্রের এ দিকটা আমার জানা ছিল না। তাই প্রথমটায় বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তবে রাগটা বেশিক্ষণ ছিল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই তুড়ি মেরে নেপোলিয়নকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। নেপোলিয়নও দেখলাম দিব্যি লেজ নাড়ছে।

আজ প্রচণ্ড শীত। সকাল থেকে কনকনে হাওয়া বইছে। বাইরেটা বরফ পড়ে একেবারে সাদা হয়ে রয়েছে। বৈঠকখানার ফায়ারপ্লেসের সামনে বসেই আজ দিনটা কাটাতে হবে। আমি জানি হাম্‌বোল্ট আমাকে আবার সুপার-চেস খেলতে বাধ্য করবে। সুপার-চেস, অর্থাৎ দাবার বাবা। এটা হাম্‌বোল্টেরই আবিষ্কার। বোর্ডের সাইজ ডবল। ঘুঁটির সংখ্যা ষোলোর জায়গায় বত্রিশ, ঘুঁটির চালচলনও দাবার চেয়ে শতগুণে বেশি জটিল। আমার অবিশ্যি খেলাটা শিখে নিতে ঘণ্টা তিনেকের বেশি সময় লাগেনি। প্রথম দিন হাম্‌বোল্ট আমাকে হারালেও, কাল পর্যন্ত পর পর তিন দিন আমি ওকে কিস্তি মাৎ করে দিয়েছি। মনে মনে স্থির করেছি যে আজ যদি খেলতেই হয়, তা হলে ইচ্ছে করেই হারব। ওর মেজাজের যা নমুনা দেখলাম, ওকে একটু তোয়াজে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

priyobanglaboi.blogspot.com